generation zero

জেনারেশন জিরো

গোলাপ মুনীর

একটা প্রামাণ্যচিত্র আছে। এর নাম জেনারেশন জিরো। এই জেনারেশন জিরোর কারণেই যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ভুল বুঝবেন না। আমাদের আলোচ্য জেনারেশন জিরো এই জেনারেশন জিরো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের জেনারেশন জিরো– সংক্ষেপে জেন জিরো– বাস্তবে হচ্ছে 'ফেসবুক ও গুগল প্রজন্ম'। এটি সেই প্রথম প্রজন্ম যারা বেড়ে উঠবে তাদের চারপাশে প্রযুক্তির আবেশ নিয়ে, তাদের জীবনের বুনন চলবে অব্যাহতভাবে প্রযুক্তি দিয়ে। আপনাকে ভেসে যেতে হবে স্মার্টফোন জেনারেশন, আইপ্যাড কিডস, ইন্টারনেট বেবিজ ... ইত্যাদি শব্দের মধ্যে।

আপনি যিনি এ লেখা পড়ছেন, আপনাকেও এই একান্ত ক্লাব প্রজন্ম থেকে বাইরে রাখতে হবে, যদিও জন্মের পর থেকে আপনার ওপর বরাবর প্রভাব ছিল প্রযুক্তির। আসলে জেন জিরো প্রজন্ম হচ্ছে সেই প্রজন্ম– যেখানে 'বেবি নেমস' গুগল করে শিশুর নাম রাখা হয়, যেখানে বাবা-মা ইউটিউব ভিডিও দেখে শেখেন কী করে বাচ্চার প্যান্ট-জামা বদলাতে হয়, কিংবা জেনে নেন কী করে শিশুর বুকে-পিঠে চেপে-ঘষে পেটের গ্যাস বের করে দিতে হয়। সে প্রজন্মে ইন্টারনেট প্যারেন্টিং হবে সর্বোত্তম উপায়। আমাদের চারপাশে এখন তেমনটি ঘটতে শুরু করেছে। এর অর্থ আমরা পৌঁছে যাচ্ছি জেন জিরোতে।

যখন 'Tech Reborn' তথা 'প্রযুক্তির পুনর্জন্ম' ধারণার সূচনা করা হয়, তখন ভাবা হয়েছিল কী করে প্রযুক্তির বিবর্তন-পরিবর্তন ঘটছে, এবং কী করে প্রযুক্তি আমাদের আচার-ব্যবহারের ধরন-ধারণে মানিয়ে নিচ্ছে। ওই মুহূর্তে জেনারেশন জিরোর কথা ভাবার আগে আমাদের প্রথমেই ভাবা দরকার, প্রযুক্তি কী করে আমাদের বদলে দিচ্ছে। এই বদলে দেয়া শুধু ব্যক্তিবিশেষকে নয়, বরং গোটা সমাজকে।

ডিজিটাল ভ্যালেন্টাইন

প্রযুক্তিপ্রেমী মানুষ আজ সবকিছুতেই প্রযুক্তির ব্যবহার করে চলেছেন। ইন্টারনেট ম্যারেজ এখন ক্রমেই সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠছে অনেক দেশেই। এমনকি আমাদের বাংলাদেশের মতো কনজারভেটিভ পরিবারগুলোতেও ইন্টারনেট ম্যারেজের প্রচলন শুরু হয়েছে। ভারতীয়রা অনলাইনে ভেটিং করছেন, বাইরে গিয়ে মেলামেশা করছেন, সেই সূত্রে এক সময় পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করছেন। খুব শিগগিরই লাইনে দাঁড়িয়ে গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি পরিসেবার বিল পরিশোধ কিংবা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে টাকা পাঠানোর যুগের অবসান ঘটবে। বিপরীত লিঙ্গের সাথে ফাস্টফুড কোর্টে আনন্দঘন সময় কাটানোর ব্যাপার না হলে এখন আর আমরা মলগুলোতেও যাই না। আমরা এখন শিখছি বাড়িতে বসেই কাজ করতে, বিনোদিত হতে, সামাজিক কর্ম সম্পাদন করতে, শেখার কাজ সারতে এবং বাজার-সদাই করতে। আজকের সত্যিকারের ডিজিটালি-খিচ্ছি কালচারে বাইরে যাওয়ার কোনো কারণ দেখি না।

তা সত্ত্বেও এই প্রাযুক্তিক অগ্রগমনের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু নিজেদেরকে একটা বড় ধরনের এক একঘেঁয়েমির রাজ্যেও নিয়ে যাচ্ছি। আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমাদের রোমান্টিক গল্প বলতে পারব না– বলতে পারব না আমরা কী করে একে অন্যের সাথে মেলার জন্য অধীর আগ্রহে থাকতাম, কী করে মিলতাম, কী করে বিয়েসংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেখতাম, ফেসবুকে প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়তাম। যা হোক, এখনো সেই চরম জেন জিরোতে আমরা পৌঁছিনি। তবে পৌঁছে যে যাব সেটুকু নিশ্চিত।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং

প্রশ্ন হচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং কি এ পর্যন্ত জানা আমাদের সমাজের অবসান ঘটাবে? হ্যাঁ, অনেকটা তাই। মনে হয় আমরা সেই সমাজ হারানোর বিষাদ-বীণার একটা সুর শুনতে পাচ্ছি। ইন্টারনেট আসার আগে, এমনকি ইন্টারনেটের শুরুর দিকে আপনি অন্যদের সাথে চ্যাট করতে পারতেন না। আইআরসি, আইসিকিউ, বুলেটিন বোর্ড ইত্যাদি ছিল ইনফরমেশন শেয়ার করার মাধ্যম। সব আইএম (ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট) সার্ভিস এলো এরপর। এসব আইএম সার্ভিস আজকের দিনে যা দেখছি, সে তুলনায় একদম সেকেলে। তখন গুরুত্বপূর্ণ ছিল শেখা (learning) ও দক্ষতা জোরদার (enhancing skills) করা। আজ আজকের দিনের লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিকীকরণ (socialising) ও আধা-বিখ্যাত (semi-famous) হয়ে ওঠা।

টুইটারের দিকেই তাকান। কুইক ব্রেকিং নিউজ, আপনার সমর্থকদের কোনো কিছু শেয়ার করা অথবা চলতি কোনো ঘটনার বিস্তারিত সংযোজন করার জন্য এটি একটি অবাক করা টুল। আমাদের কতজনই এটিকে এভাবে ব্যবহার করে? ফেসবুক যেমন বিশ্বের সবচেয়ে বড় কলেজ ক্যাফেটারিয়া। সেই সাথে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফটো অ্যালবামও। আমাদেরকে সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে– আমরা কী করছি, জেনারেশন জিরো শিশুরা কত সুন্দর, গত রাতে আমরা কী খেয়েছি, কত স্বাদের ছিল সে খাবার, গতকাল কোথায় ছিলাম, আজ কোথায় আছি, এমনি আরো কত কী? অপরদিকে জেন-ওয়ান (প্রশ্নে আমরা, তুমি, আমি) এক সময়ের সিকিউরিটি ও প্রাইভেসি নিয়ে আশঙ্কা করতাম। কিন্তু এখন আমরা আমাদের সিকিউরিটি ও প্রাইভেসির বিষয়টি জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ভাবি জেন জিরো নামের প্রজন্ম আর কতদূর গিয়ে পৌঁছবে।

আজকে আমরা এমন এক দুনিয়ায় বসবাস করছি, যেখানে 'টুইট' বলতে আমরা কোনো পাখির মিষ্টি ডাক বুঝি না। যেখানে আপনার সবচেয়ে বিস্তারিত জানা মানুষের মধ্যে সবাইকে ভালো বন্ধু বলবেন না, আমরা কি সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি? ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি এমন একজন লোকের সবকিছু জানতে পারবেন, যার সাথে আপনার কোনোদিন সাক্ষাৎই হয়নি। ওই লোকও জানত না আপনাকে, আপনার পরিবারকে, আপনার সন্তানদের– অনলাইনে কিছু পোস্ট করার আগে। নিশ্চিতভাবে এমন মনে হতে পারে– বিষয়টি যেনো এমন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ের এই যুগে আমরা আরো বেশি করে অ্যান্টি-সোশ্যাল বা অসামাজিক হয়ে উঠছি।

প্রযুক্তিসূত্রে উত্থান

শুরুতেই উলি-খিত আইপ্যাড কিডস বিষয়ে ফিরে আসি। আমি একজন ট্যাবলেট পিসির মালিককেও জানি না, যিনি হতে পারেন একজন বাবা কিংবা একজন মা, যিনি অবাক করা আইপ্যাড প্যারেন্টিংয়ের প্রশংসা করেননি। আসলেই এটি অতি সহজ : একজন শিশু যখন দুই বছর বয়সী হয়, তখন তার হাতে তুলে দিন একটি আইপ্যাড। আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমার বয়স যখন ১৮, তখন ৬ বছর বয়সী এক শিশুকে দেখা গেছে সে প্রযুক্তিকে আমার চেয়ে বেশি জানে। জেন জিরো শুধু স্মার্টই নয়, এই প্রজন্ম আগের প্রজন্মের তুলনায় প্রযুক্তির সাথে অধিকতর ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। এরা শেখে অধিকতর দ্রুত, এরা নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় নতুন ডিভাইসকে গ্রহণ করে এবং সব নতুন উদ্ভাবনার সাথে তাল মিলিয়ে চলে। আমরা ৮ বছর বয়সেই পেয়ে যাচ্ছি ডিজিট রিডার্স, যা এরই মধ্যে কোডিং করছে। ডিজিটাল চামচ মুখে নিয়ে জন্মাবার জন্য তাদের ধন্যবাদ।

দুর্বল তুখোড়েরা?

বিশ্বের নানা জায়গায় নানা সমীক্ষায় দেখা গেছে, আমাদের ডিজিটাল লাইফস্টাইল আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। এখন আমরা

(বাকি অংশ ১০৩ পৃষ্ঠায়)

জেনারেশন জিরো

(১০৩ পৃষ্ঠা পর)

যতটা না হাঁটি বা দৌড়াই, তারচেয়ে বেশি বসে থাকি কমপিউটারের সামনে। সব সময় কাজ করি, খাই অস্বাস্থ্যকরভাবে, বোকার মতো তাকিয়ে থাকি অগুণতি অনলাইন ও টিভি চ্যানেলের দিকে, নষ্ট করি ঘুম। ফলে সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমরাই যদি এখন সবকিছুতেই আমাদের জীবন ডিজিটালি উপস্থাপন করি, তবে যে প্রজন্ম তাদের চারপাশে শুধু প্রযুক্তি আর প্রযুক্তি জন্ম নিচ্ছে, তাদের অবস্থা কেমন হবে? বলছি 'জেন জিরো' নামের প্রজন্মের অবস্থাটা কী হবে?

আমরা যদিও সভ্যতা হিসেবে অধিকতর স্মার্ট হিসেবে বেড়ে উঠছি, আমরা যে পথে চলছি তা কিন্তু স্মার্ট নয়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, মানব জাতি সঙ্কট ও বিপর্যয় মোকাবেলায় আগের চেয়ে আরো দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমরা পেছনে ফেলে এসেছি দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও একটি স্নায়ুযুদ্ধ। তারপরই আমরা দেখছি– আমাদের তরুণেরা সফটওয়্যার তৈরি করছে, কিন্তু মোকাবেলা করতে পারছে না বিশ্বের ক্ষুদ্রতম বাস্তব সমস্যার। এক সাথে লাখ লাখ কাজ করে ফেলার যে প্রবণতা, সম্ভবত তাই হচ্ছে জেন জিরোর সামনে সবচেয়ে বড় বাধা। আমরা নিশ্চিত এরা মাল্টিটাস্ক করবে। কিন্তু সব কাজের কাজি হতে চাইলে একটারও শেষ দেখা যায় না, তাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

ডার্নিং-ক্রুগার ইফেক্ট

চার্লস ডারউইন একবার বলেছিলেন : 'Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge.' এর সারকথা হচ্ছে : জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানতাই বেশিসংখ্যক বার আস্থার জন্ম দেয়। কার্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাভিড ডার্নিং ও জাস্টিন ক্রুগার আন্ডারগ্র্যাজুয়েটদের ওপর একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। সমীক্ষায় তাদের দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়েছিল, যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল হিউমার, লজিক ও গ্রামার। ছাত্রদের পরীক্ষা করার পর তারা শেয়ার করেছিল একজন ছাত্রের টেস্ট রেজাল্ট এবং ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করেন তাদের কোন র‍্যাঙ্কিংয়ে ফেলা হয়েছে। তারা যা পেয়েছিল তা হলো– দুর্বলতর ছাত্ররা ভয়াবহভাবে তাদের র‍্যাঙ্কিং বেশি বলে ধরে। অপরদিকে বেশি স্কোরধারীরা তাদের র‍্যাঙ্কিং অনেক কম ধরে। এভাবে এরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, মানুষ 'illusory superiority'-তে ভুগতে চায় কিংবা মূলত আপনি নিজেকে যত বোকাই ভাবুন, নিজেকে যত স্মার্টই ভাবুন, তা আপনাকে ভাবতে হবে বাকি দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে। আর এটিই আপনা-আপনি ফুটে ওঠে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ফোরামে ও আজকের দিনের বেশিরভাগ জনসমাগম স্থলে। মানুষ মন্তব্য করতে পছন্দ করে এবং সত্যিকার অর্থে দু-পয়সা খরচ করে এ বিশ্বাসে যে, এরা হচ্ছে উইটি, ফানি, লজিক্যাল কিংবা কোনো না কোনোভাবে মূল্য সংযোজন করছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা নয়।

এর অনুগামী এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সামান্য শিক্ষণে দুর্বল ছাত্ররা তাদের র‍্যাঙ্ক অধিকতর দ্রুত প্রাক্কলন করতে সক্ষম, এমনকি টেস্টে ভালো না করলেও। আসলে এর অর্থ একটি রিয়েলিটি চেকের পর আমরা অধিকতর ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারি– কোনটি অধিকতর ভালো, আর কোনটি নয়। একমাত্র সমস্যা হচ্ছে বাস্তব জগতের বন্ধু, বাবা-মা, শিক্ষক, আপনার শ্রদ্ধেয় মানুষ থেকে রিয়েলিটি চেক নিশ্চিত করা, যখন আপনি সর্বশেষ সেই ব্যক্তির প্রতি অনলাইন মনোযোগ দিয়েছিলেন, যিনি আপনাকে অপমান করেছেন আপনার জ্ঞানের অভাবের জন্য।

ফিডব্যাক : gmunir@comjagat.com